মূলপাতা

ক্রীড়ারঙ্গ, পর্ব-১

Nazmus Sakib

2015-10-17 18:49:00 +0600 +0600

11 MIN READ

দক্ষিণপূর্ব ফ্রান্সের ল্যাসকক্স নামের গুহামালায় মানব ইতিহাসের প্রি-হিস্টরিক কিছু চিত্রাঙ্কন পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। বিচিত্র রকম চিত্রাঙ্কনে গুহার দেয়ালগুলো চিত্রিত। ছবিগুলোর মাঝে অন্যতম কিছু ছবি হল কিছু মানুষ দৌড়াচ্ছে কিংবা কুস্তি লড়ছে। ছবিগুলো প্রায় ১৭৩০০ বছর আগের।

খেলাধুলা বা স্পোর্টস বিষয়টা নতুন কিছু নয়। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ ছুটোছুটিপ্রিয়। সেই ছুটোছুটিকেই ছোটখাটো নিয়মের জালে আটকে ফেলে শুরু হয় খেলার। ঠিক কবে থেকে খেলাধুলা শুরু হয়েছে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও, বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলা একটি সুবিশাল অংশ দখল করে আছে সন্দেহ নেই।

মানুষ খেলাধুলা কেন করে, সেই প্রশ্নের অনেকরকম উত্তর হয়। কেউ ফুরফুরে সময় কাটাতে খেলেন, কেউ সময় 'কিল' করতে খেলেন, কেউ শরীর ফীট রাখতে খেলেন, কেউ পয়সা কামাতে খেলেন। তবে এতগুলো উদ্দেশ্যের মাঝে খেলাধুলা করার সবচে মোক্ষম উদ্দেশ্য হতে পারে শরীর ফীট রাখা। সন্দেহাতীত ভাবেই খেলাধুলা ফিটনেস ধরে রাখার ও শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার একটি কার্যকর মাধ্যম।

তবে বিংশ শতাব্দীর এই সময়টাতে, খেলাধুলা আদৌ আর শরীরচর্চার মাধ্যম হিসেবে বেঁচে আছে কিনা, তা নতুন করে ভাবনার প্রয়াস রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখনকার সময়ে খেলাধুলা 'করার' চাইতে 'দেখার' বিষয় হয়েছে বেশি।

খেলাপ্রেমী জাতি হিসেবে মার্কিনীদের বেশ নামডাক রয়েছে। বিচিত্র কিসিমের, নানারকম খেলাধুলায় তাদের সরব উপস্থিতি। তবে অনলাইন বিভিন্ন ব্লগ ও এনালিসিস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, যে এই মার্কিনীদের মাঝে এখন খেলাধুলা হয়েছে ড্রইং রুমের টিভি সেটের ভেতরে চেপে রেখে তাতে ফ্যানাটিক হয়ে যাওয়ার বিষয়। যে কেউ চাইলে গুগলে স্পোর্টস এডিকশান সার্চ দিলে অনেক তথ্য মিলবে, যাতে স্পোর্টস এর প্রতি (দেখার প্রতি, খেলার প্রতি নয়) অতিমাত্রায় তাদের এই আকর্ষণকে রীতিমত 'নন-মেডিকাল পদ্ধতিতে' এডিকশান বা আসক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শুধু মার্কিনীদের দিকে চেয়ে লাভ নেই। আমরা খোদ বাঙালিরাই এই ধরণের আসক্তিতে পতিত। দুর্মুখেরা বলে, বাঙালি আরামপ্রিয় জাতি। কথাটা কতটা সত্য, সেদিকে না গিয়ে বর্তমান খেলাধুলার প্রেক্ষাপটে নজর দিলে দেখা যাবে, আমরা যতটা না খেলি, তার চাইতে বহুগুণ বেশি খেলা নিয়ে মাতামাতিতেই পড়ে থাকি। সেটা বাংলার দামাল ছেলেদের কামাল খেলা নিয়ে হৈ-হুল্লোড় হোক কিংবা ইংলিশ প্রিমিয়ার/লা লিগা নিয়ে রাতভর চেঁচামেচিই হোক।

অনেক বিশ্লেষক যখন আসক্তির বিশ্লেষণ করেন, তখন আসক্তির কয়েকটি মাত্রা নির্ধারণ করেন। কি ধরণের আচরণ কোনো একটি বিষয়ের প্রতি কাউকে আসক্ত করে তুলতে পারে বা তাকে সে বিষয়ে আসক্ত বলা যায়, সেই বিষয়ে তারা আলোকপাত করেন। মেডিকেল সাইন্স যদিও এখন পর্যন্ত 'খেলা দর্শনে আসক্তি' নামে অফিশিয়ালি কোন এডিকশানের ঘোষণা দেয়নি, তারপরেও অন্যান্য আসক্তির সাথে মৌলিক কিছু মিল পাওয়া যায় খেলাধুলার প্রতি অতি মনোযোগের মাঝে।

এমন অনেক মানুষ আমরা সবাই দেখেছি, যিনি সারাক্ষণই খেলা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। অমুক দেশের প্রিমিয়ার লীগ কিংবা তমুক দেশের ডমেস্টিক ক্লাব ইত্যাদির খবর যার নখদর্পণে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, খেলার প্রতি তার আকর্ষণ যে শুধু কয়েক ঘন্টা ঐ টিভি সেটের সামনে বসে থাকাতে সীমাবদ্ধ, তা নয়। তার এই আকর্ষণ আর মনোযোগকে তিনি ঠেলে নিয়ে যান আরো কয়েক কদম সামনে। তিনি তার কর্মস্থল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেই খেলা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। অনলাইনে অনেক কমিউনিটি থাকে, সেসবেও তিনি যোগ দেন। পোস্ট, কমেন্ট ইত্যাদি করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন। নেটে

প্রিয় দলের ওয়েবসাইট কিংবা ফিফা/ক্রিকইনফো ইত্যাদি সাইটে ঘুরে বেড়ান পছন্দের দলের সর্বশেষ আপডেট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে।

সাদা দৃষ্টিতে এইসব আচরণ মূলত 'ওকে' কিংবা 'সমস্যা কোথায়' ঘরানার মনে হলেও, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই ধরণের আচরণকেই আসক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোন কিছুর ব্যাপারে নিজেকে অতিরিক্ত জড়িয়ে ফেলা, যার কোন প্রোডাকটিভ বেনেফিট নেই, একেই আসক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

যে বিষয়টা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, তা হল এই যে ব্যক্তিটি তার জীবনে খেলাধুলাকে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই স্থান দিয়ে ফেলেছেন, এটি অবশ্যই তার প্রোডাকটিভ সময় নষ্ট করছে। আমরা যারা এখনো ছাত্রজীবনে আছি, তারা স্পষ্টতই তরুণ বয়সীদের এই অতিমাত্রায় আসক্তি লক্ষ্য করছি। যখনই কোন একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়, প্রথমে সবাই ঘন্টার পর ঘন্টা সেই খেলা দেখে থাকেন। খেলা শেষ হলে শুরু হয় এনালিসিস দেখা। এখনকার স্পোর্টস টিভি চ্যানেলগুলোতে খেলার এক ঘন্টা আগে থেকে সেই যে এনালিসিস শুরু হয়, তা শেষ হয় খেলার শেষ হবারও ঘন্টা খানেক পরে। তাই দেখা যায় এই এনালিসিসের পেছনে সময় দিতে হয় আরো কয়েক ঘন্টা। এরপর আসে সোস্যাল মিডিয়া। ফেসবুকের কল্যাণে এখন হাজারো স্পোর্টস পেইজ আর গ্রুপ জন্ম নিয়েছে, যেখানে দিনরাত খেলাধুলার পোস্টমর্টেম চলে। টিভি এনালিসিস শেষ করে তখন সবাই ঢুকে পড়েন এইসব গ্রুপে নিজেরাই এনালিসিস করতে। এতে দিতে হয় আরো কিছু সময়। এমন অনেক তরুণ ছাত্র রয়েছে, যারা ফেসবুকে সারাক্ষণই অনলাইনে থাকে শুধুমাত্র এইসব গ্রুপের পোস্ট ফলো করার জন্য।

এভাবে দেখতে গেলে একজন ব্যক্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা প্রোডাকটিভ সময়ের মধ্যে (৮ ঘন্টা ঘুম বাদে) প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘন্টা চলে যায় একটি খেলার পেছনে, যার কোন দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান উপকারিতা নেই। বরঞ্চ, নিয়মিত এই ধরণের কাজকর্মে জড়িত থাকার দরুন অনেকের জন্যেই তা পরিণত হচ্ছে ভয়ানক আসক্তিতে। যার অন্যতম প্রমাণ হল প্রিয় দলের পরাজয়ে হতাশা। আমরা কজন আছি, যাদের কানে কখনো এমন খবর আসেনি, যে প্রিয় দলের পরাজয়ে হার্ট এটাকে মৃত্যু কিংবা স্টেডিয়ামে দর্শকের হামলা? আমাদের দেশের ঘরোয়া ফুটবলে এখন রেফারির ওপর দর্শকের হামলা একটি নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য।

প্রশ্ন আসে কিভাবে একটি সামান্য খেলার জন্যে এই ধরণের অদ্ভুত আচরণ মানুষ করতে পারে? যেখানে বিষয়টা আক্ষরিক অর্থেই একটি 'খেলা'?

এক্ষেত্রে টিভি একটি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে সন্দেহ নেই। খেলাধুলা যখন থেকে ঘটা করে 'আয়োজন' করার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তখন থেকেই মানুষের এই খেলার প্রতি অপ্রয়োজনীয় আকর্ষণের গোড়াপত্তন। আর টিভির লাইভ টেলিকাস্ট তাতে যোগ করেছে সুস্বাদু মসলা। যে খেলা শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের কার্ডিফবাসী দেখতে পারার কথা, সেই খেলা একই সাথে এখন দেখছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের চায়ের দোকানে ভিড় করা গ্রামবাসীও। অথচ, এই গ্রামবাসীর কোনদিন কার্ডিফ গিয়ে খেলা দেখার কথা নয়। তাদের এই অপ্রয়োজনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে টেলিভিশান।

টিভির লাইভ টেলিকাস্ট এই খেলা নিয়ে ফ্যানাটিসিমকে বৈশ্বিক রূপ দিয়েছে। এখন রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস টিপলেই পৃথিবীর ঐ পারের খেলা আমার সামনে। খেলা দেখতে পারার সম্ভাবনার সাথে আমার সামনে খুলে যাচ্ছে স্পোর্টস এডিকশানের অপার সম্ভাবনাও। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে দেখা যাবে, যদি এইভাবে খেলাটি আমার সামনে উপস্থিত না হত, আমি না এই খেলার দেখার পিছনে দুটো ঘন্টা ব্যয় করতাম, না তার এনালিসিস নিয়ে ব্যয় করতাম আরো কিছু অতিরিক্ত সময়। ফলে সম্পূর্ণ বিষয়টাই খাল কেটে কুমির আনার মতই। আমাদের মূল্যবান সময়কে 'বিনোদনের' নাম দিয়ে আমরাই নষ্ট করছি।

আমরা যদি ওল্ড স্কুল পদ্ধতিতে দুজন ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করি, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটাই পরিষ্কার হতে পারে। ধরা যাক, দুজন ব্যক্তি একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কাজ শেষে দুজনেই বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে রিলাক্স করছেন। একজনের বাসায় টিভি আছে আর তাতে খেলা চলছে, অন্যজনের বাসায় টিভি নেই। যার বাসায় খেলা চলছে, তিনি স্পোর্টস ফ্যানাটিক না হলেও

কিছুক্ষণ বসে থাকবেন সেই খেলার সামনে, এটাই স্বাভাবিক। একটা ওভার দেখি, কিংবা টাইব্রেকারটা দেখেই উঠি, এমন নিয়ত নিয়ে অনেকেই কখন যে ঘন্টা কাভার করে দিয়েছেন, টেরও পাননা। আবার অন্যদিকে যার খেলা দেখার সুযোগ নেই, তিনি যদি বসে বসে একটা পত্রিকাও পড়তে থাকেন কিংবা তার স্ত্রী-সন্তানদের সেই অবসর সময়টা দেন, তাতে অন্তত তার সময়টার উত্তম ব্যবহার হয়।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, খেলা দেখা খুব খারাপ—এমন কোনো দাবি করা হচ্ছেনা। তবে খেলাকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করে, তা শুধু 'দেখা' পর্যায়ে উন্নীত করে, তার পেছনে অহেতুক সময় ব্যয় করাকেই নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে এই, যে কেউই যখন কোনো খেলা সম্পূর্ণ দেখতে যাবেন, এই ধরণের সময়ের অসদ্ব্যবহারে তিনি পতিত হবেনই।

ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের কথা যদি ধরি, দেখা যায় শুধুমাত্র খেলার পেছনে পাঁচ পাঁচটা দিন কিছু লোক ফেলে দিচ্ছেন আর লক্ষ কোটি দর্শক তাদের সাথেই তাদের মূল্যবান সময় পানিতে ফেলছেন। অথচ আমরা প্রায় সবাই জীবনের কোন না কোন সময়ে 'সময়ের মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধ শিখে পরীক্ষার হলে উগলে দিয়েছি। বাস্তবে এই খেলাধুলার প্রতি অতিমাত্রায় জড়িয়ে যাওয়া আমাদের সময়কে কিভাবে ধ্বংস করছে, তা হয়তো আমরা অল্পই উপলব্ধি করছি। এর পেছনে মূখ্য ভুমিকায় আছে ড্রয়ইং রুমের টিভি সেটখানা। যেটির অনুপস্থিতিতে অনেকেই হয়তো সময়গুলো অন্য কোন উত্তম খাতে ব্যয় করতে সক্ষম হতাম। কেননা দশ মিনিট পর পর নেট সার্চ করে খেলার পেছনে লেগে থাকতে হয়ত কারোই অতটা আরামদায়ক মনে হবেনা, যতটানা আরামের সোফায় বসে টিভিতে দেখে পাওয়া সম্ভব।

জার্মানির আলোচিত সমালোচিত হিটলারের নামে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তবে এটা জাপানের নামেও প্রচলিত আছে। গল্পটা নেহায়াতই হয়ত জোক। তবে মেসেজটা গুরুত্বপূর্ণ।

জার্মানিতে ক্রিকেট খেলা এসেছে তখন। তিনি খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খেলা চলছে?" সে ব্যক্তি উত্তর দিল "ক্রিকেট।" হিটলার কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। দুই তিন দিন পর আবার হিটলার সেই খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনও খেলা চলছিল। খেলা শেষে হিটলার একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কত নাম্বার খেলা চলছিল?" সে ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "ওইদিনের খেলাটাই।" হিটলার অবাক হয়ে বললেন, "জিতল কে?" ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "কেউ না, খেলা ড্র।"

এরপর হিটলার জার্মানিতে ক্রিকেট নিষিদ্ধ করে দিলেন।

[২]

খেলাধুলাকে মাঠের কাদামাটি থেকে তুলে সর্বপ্রথম ড্রইং রুমের টিভি সেটের ভেতর যারা স্থাপন করেছেন, তাদের কারোরই হয়তো এই খেলাধুলার আজকের রূপধারণ করার ব্যাপারে দূরদৃষ্টি ছিলনা। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে খেলাধুলাও রেহায় পায়নি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে।

টেলিভাইস্ড খেলার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হল বিজ্ঞাপন বা টিভি কমার্শিয়াল। ক্রিকেটের ক্ষেত্রেই যদি ধরি, তাহলে প্রতি ওভার পরপর, প্রতি উইকেটের পরপর, প্রতি ব্রেকের পরপরই স্ক্রিনে আসে বিজ্ঞাপন বিরতি। যেহেতু বর্তমানে অধিকাংশ খেলাই ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তাই বিজ্ঞাপনগুলোতে থাকে তাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রভাব। খুব কম বিজ্ঞাপনই দেখা যায়, যেখানে অর্ধ নগ্ন কোন নারীর উপস্থিতি থাকেনা কিংবা কোন নারীকে আকর্ষণীয় উপায়ে উপস্থাপন করা হয়না। ফলে নেহায়াতই যারা বেশরম ও লজ্জাশরমের মাথা খাওয়ায় ওস্তাদ, তার ব্যতীত সকলেই এইসব বিজ্ঞাপন দেখে বিব্রত হবেন। বিশেষ করে যখন তারা খেলাগুলো পারিবারিক সদস্যদের সাথে একসাথে বসে উপভোগ করে থাকেন। আমাদের দেশের মানুষের নৈতিক অধঃপতন এখনো তলানিতে ঠেকেনি বলেই আমার বিশ্বাস। তাই এই ধারণা

করতে পারিনা, যে হঠাৎ বিজ্ঞাপনে একজন রমনী আপত্তিকর পোষাকে উপস্থিত হয়েছেন আর বাথটাবে শুয়ে তার শরীরে সাবান মাখতে উদ্যত হচ্ছেন, কিন্তু কোন বাবা কিংবা বা তার ছেলে বা মেয়ের সামনে তা দেখতে ইতস্তত বোধ করছেন না বা অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন না।

তবে লোহাকে যেমন খোলা আকাশের নিচে রেখে দিলে তাতে মরচে ধরে যায়, এইধরনের বিষয়গুলো প্রশ্রয় দিলে তাতে অভ্যস্ত হতে আমরা বাধ্য। এটাই স্বাভাবিক। যখন কোন পরিবারের সদস্যরা একসাথে এইধরণের বিজ্ঞাপন দেখেন, তখন প্রথম প্রথম বিব্রত লাগলেও, তা বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে তা অবশ্যই তাদের গা সয়ে যাবে। ফলে দেখা যাবে শেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনে কোন পুরুষকে কোন অর্ধ নগ্ন নারী আপত্তিকরভাবে জড়িয়ে ধরেছেন, আর বাবার পাশে মেয়ে বসে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দেখছেন। নৈতিক অধঃপতনটা ঠিক এভাবেই শুরু হয়। ছোট ছোট পদক্ষেপে। কেউ একলাফে বরবাদির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছে বলে হদিস পাওয়া যায়না। এছাড়াও এইসব বিদেশী বিজ্ঞাপনে তাদের নানারকম সংস্কৃতিকে প্রচার করা হয়। বৈদেশিক নানা সংস্কৃতি আমাদের মনের অজান্তেই ধারণ করা শুরু করাটা অস্বাভাবিক নয়। অথচ সবকিছুই আমরা ছাড় দিচ্ছি ঐ খেলা দেখার অজুহাতেই।

আসি টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট প্রসঙ্গে। আমেরিকান বাস্কেট বল কিংবা বেসবল থেকে ধার করা 'চিয়ার লীডার' কনসেপ্ট এখন টি-টুয়েন্টি গেমের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। বরাবরের মতই এখানে নারী দেহের প্রদর্শন হল মৌলিক বিষয়। প্রতিটি চার ছক্কা কিংবা উইকেটের পতনের পর সল্পবসনা কতিপয় নারী শুরু করেন উদ্দাম নৃত্য। ক্যামেরাও ঘুরে যায় তাদের দিকে। নানা ভঙ্গিমায় ভিডিও করা হয় তাদের নৃত্য। আর ড্রইং রুমে বসে সেই নৃত্য একই সাথে দেখছেন পরিবারের সদস্যবৃন্দ। ফলে বাসার ছোট-মিয়া থেকে শুরু করে বড়-মিয়া পর্যন্ত মুফতে উপভোগ করছেন নারী দেহের নাচন, যা তাদের মনোদৈহিক পরিবর্তনে রাখতে পারে কার্যকর ভূমিকা।

অশালীন ভিডিও আর নারী দেহের উপস্থাপন শিশু কিশোরদের উপর কী প্রভাব ফেলে তা জানতে রিসার্চ করতে হয়না। আমেরিকান কিছু ট্যাবলয়েডের ওয়েবসাইটে নিয়মিত চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন ১০ বছরের বাচ্চা তার সহপাঠীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হচ্ছে কিংবা তার শিক্ষিকার দিকে বাড়াচ্ছে অযাচিত হাত। এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই তাদের এই মানসিক বৈকল্য ঘটছে। আর এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হল সেগুলো, যা আমরা স্পষ্ট দেখেও না দেখার ভান করছি। আমার বাসার কিশোর ছেলেটি খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে নারীদেহের রহস্য উদঘাটন করছে, আর এতে তার উপর কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বেনা, সেটা আশা করাই এক প্রকার মানসিক অসুস্থতা।